রবীন্দ্রগীতির অন্তরা

অমিয় চক্রবর্তী

বনের প্রান্তে ওই মালতী লতা
করুণ গন্ধে কয় কী গোপন কথা—

গানের লয়ে এবং কাব্যছন্দে একটুখানি যতি পড়ার কালে কবি কি দৈবাৎ বাগানে দূরে ঐ মালতীলতার দিকে চেয়ে দেখলেন? অথবা ভাবের যে-মৃত্যুসমর্পিত শ্রাবণচ্ছায়াময় মুহূর্তে গান শুরু হয়েছিল তখনই কি ঐ পুষ্পিত মাধুরী কবির দৃষ্টি চেতনার অন্তর্গত ছিল? না, 'করুণগন্ধে' বলা নীরব সাক্ষ্য তাঁর বিদায় প্রসঙ্গের চিন্তায় ধীরে ধীরে মিশ্রিত হয়ে অন্তরা-য় ধরা দিল? একটি অন্তরা-য় বেঁধে আরও প্রশ্ন তোলা যায়, উত্তর আছে গানের সুরে এবং কথার ইঙ্গিতে; সহজে তা ধরা পড়ে না।

রবীন্দ্রগীতির অন্তরা তাঁর গানে-রত মানসলোকে ধ্রুব অবসর দান করেছে, এরকম বহু উদাহরণ দেওয়া যায়। ভাবনা ও সুরের সন্ধিক্ষণে যেন তিনি সেইখানে এসে দাঁড়িয়েছেন, সৃজন গতিকে নূতন পথে চালিত করেছেন। অনেক সময়ে দেখা যায় অন্তরা-য় এসে তাঁর গানের মোড় ঘুরে গেল, ঝোঁক বদ্‌লিয়ে অথবা অপ্রত্যাশিত শিল্পিত নূতন গলি বেয়ে তাল এবং বাক্য সাধিত হল। বলা বাহুল্য অবচেতনার তলে তলে গান তৈরি হয়ে ওঠে, সেই ধ্বনির তরঙ্গময় চিত্তবেগ গণনা করা যায় না। কিন্তু বিশেষ দৃষ্টির ক্রিয়া দেখা যায় রবীন্দ্রগানের অন্তরা-য়, অনুশীলন করবার বিষয় এটি।

আজি এল হেমন্তের দিন
কুহেলিবিলীন, ভূষণবিহীন—

এখানে অন্তরা চিত্র দিয়ে পূরণ করল যুক্তির অঙ্গ। বিশেষ ঋতুর স্থির দৃষ্টান্তের দ্বারা ভাবচ্ছবিকে আরো স্পষ্ট করা হল। সুরও এখানে জ্বলে উঠল বৈরল্য-বেদনার ধীরগামী অনির্বচনীয়তায়। বনে মল্লিকার মেলা, পল্লবে পল্লবে উতলা বায়ু ছিল যে-হৃদ্‌বসন্তের উচ্ছল প্রতীক, তাকে অতিক্রম ক'রে এই প্রতীক-হেমন্তে উদাসীন অপেক্ষমান জীবন উপনীত। প্রকৃতির বদল, বৎসরের শেষ, প্রাণের দিনান্ত, 'কুহেলিবিলীন ভূষণবিহীন' ঐশ্বর্যে ভরে উঠেছে এই অন্তরার চিত্রপট।

কখনো বা প্রত্যক্ষ ছবি দিয়ে গানের আরম্ভ, কিন্তু অন্তরা-য় এসে, ভাবের কাঠামো স্পষ্ট হল। বৃহত্তর ভূমিকাটিকে দাগ দিয়ে টানা হয়েছে।

শূন্য করে ভরে দেওয়া যাহার খেলা
তারি লাগি রইনু বসে সকল বেলা—

আমলকির ডালে ডালে শীতের হাওয়ার নাচনে যে আসন্ন অবসানের ছবি, তারই সর্বগতানন্দ ভাবটিকে কবি এই অন্তরা-য় তত্ত্বরূপে তুল ধরলেন। সামান্য জমিতে তার জায়গা হল।

বিচ্ছেদেরি ছন্দে লয়ে
মিলন ওঠে নবীন হয়ে

অথবা

ওগো অকরুণ, কী মায়া জান
মিলন ছলে বিরহ আন

— এই দুটি গানেও রবীন্দ্রনাথ সুরের ঐশ্বর্যে ভ'রে মূল যুক্তিকে অন্তরা-য় উপস্থিত করেছেন। হয় সাক্ষাৎ সম্বোধনে, নয় ভাবের বর্ণনায়। এই দুটি অন্তরা-য় মানসিক পদচারণধ্বনি শোনা যায়, যদিও তা অন্তর্লীন এবং গীতসমাশ্রিত।

পরজ ভাঙা গানের ধুয়োয় যার অবতরণিকা সেই গানকে নেওয়া যাক। এখানে অন্তরার স্থান এত সূক্ষ্ম গভীরার্থনিহিত এবং অলোকরাগিণীময় যে বিশ্লেষণ আরোই অসম্ভব। যে-গান আরম্ভ হয়েছিল গভীর আলো-অন্ধকারের রাত্রে, অবসিত-প্রায় চাঁদকে প্রতীক করে, সেই তিমির বিদীর্ণ জীবনমৃত্যুসন্ধিময় গান ধীরে ধীরে অবতীর্ণ হল অন্তরার যৌগিক ক্ষেত্রে। 'যেন কোন ভুলের ঘোরে' ঐ চাঁদ রজনীর শেষ পক্ষে স'রে স'রে যাচ্ছে; যেন একটি বিরতির পর্বে কবি অন্তরা-য় দুটি লাইনে নেমে এলেন, প্রশ্ন করলেন :

প্রহরগুলি বিলিয়ে দিয়ে
সর্বনাশের সাধন কী-এ—

এই ভাষাতীত, এমন-কি সংগীতের শ্রুতিস্পর্শাতীত গানের সন্ধিস্থলে চাঁদ প্রত্যক্ষ হল, ঠিক প্রত্যক্ষের বাহিরে যাবার মুহূর্তে। এখানে বর্ণনার পারগামী ছবি ও একটি অনন্ত প্রতীতি একক ধ্যানের অঙ্গীভূত। ব্যাখ্যা করা যাবে না। গান শুনতে হবে। অন্তরা যেন মোহনা; সেখানে শুক্লান্ধকারের প্রথম হালকা চাঁদ এবং মরণ 'ফুলের মধুকোষে' অধিষ্ঠিত মৃত্যুঞ্জয়সাধনার চাঁদ ঔপনিষদিক অর্থে 'স্যন্দমান'। ভাষার কাঠামো তার সৌকর্য, সুরের আবশ্যিক ছেদ এবং যুগ্মতা সব দিক থেকে অন্তরা-র বিশেষ আলোচনার অপেক্ষা রইল।

পুরোপুরি কবিতায় এই গতি ও বিরতি, এই বিশেষ স্বল্প পৃথক ঘেরের মধ্যে ধ্যানের বস্তু ও ধ্যানের ধ্বনিকে বসিয়ে দেখা কঠিন। চতুর্দিকের চলমান পার্থিব ঘটনার ছায়া যেমন গানের অন্তরা-য় ক্ষণমাত্র কাছে এনে গানের দূরত্বে যাওয়া সম্ভব, তা কবিতায় দুঃসাধ্য। রবীন্দ্রগীতির অন্তরা যোজনার রহস্যে দীপান্বিত।

রবীন্দ্র শতবার্ষিকী জয়ন্তী সংখ্যা/১৯৬১ থেকে পুনর্মুদ্রিত। রচনাটি অনুপ মতিলালের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

অমিয় চক্রবর্তী : (১০ এপ্রিল, ১৯০১ - ১২ জুন, ১৯৮৬) বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রখ্যাত কবি এবং রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সচিব ছিলেন।